শিল্প-সংস্কৃতি ও ইসলাম

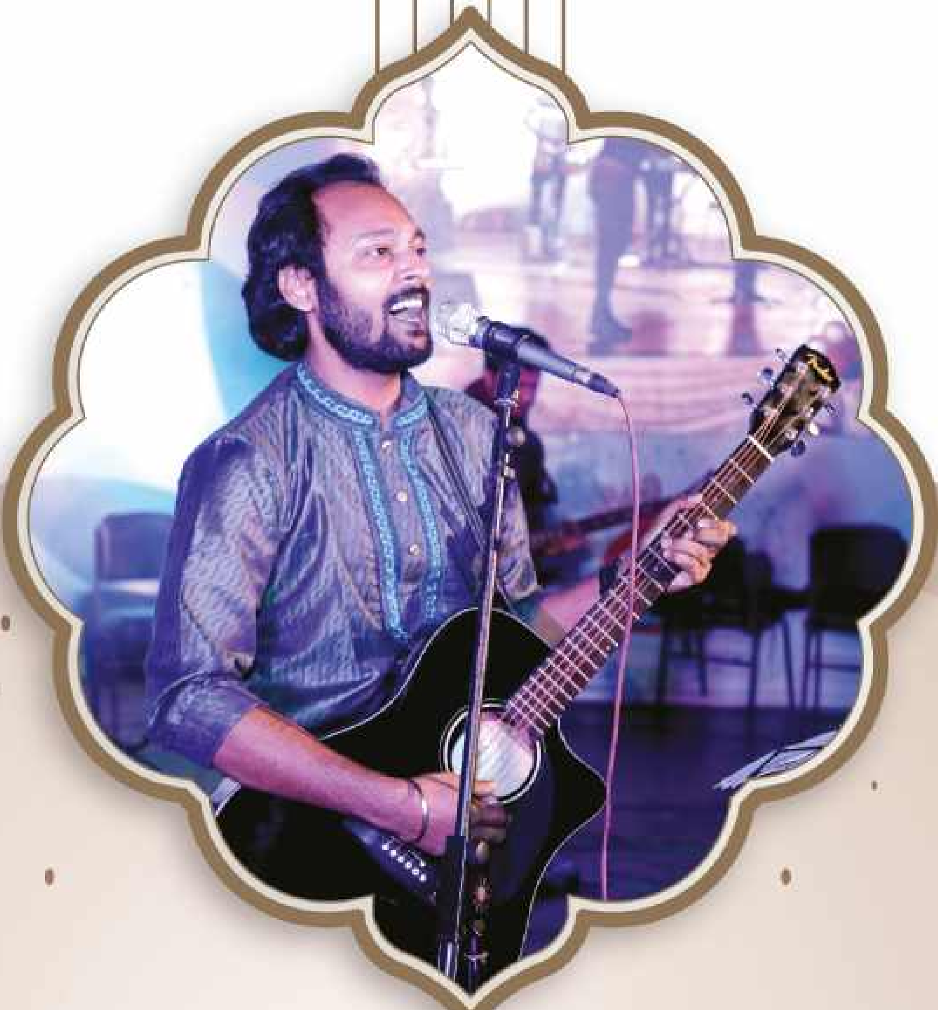

রিয়াদুল হাসান

মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী

সংস্কৃতিচর্চার হাত ধরে আসুক নবজাগরণ

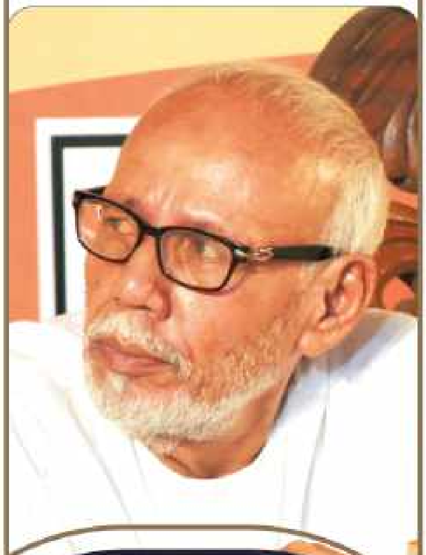

শিল্প-সংস্কৃতি ও ইসলাম

রিয়াদুল হাসান

তওহীদ প্রকাশন

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়	:	তওহীদ প্রকাশন ১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। tawheedprocation@gmail.com
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ	:	ওবায়দুল হক বাদল
লে-আউট কম্পোজিশন	:	ওবায়দুল হক বাদল
প্রুফ রিডিং	:	মাহবুবা আক্তার রিপা
প্রকাশকাল	:	১ জুলাই ২০২৪
মূল্য	:	২২৫ টাকা
সর্বস্বত্ব	:	প্রকাশক

সূচিপত্র

১. **শিল্প-সংস্কৃতি ও ইসলাম--৪**
বাস্তবেই কি ইসলাম যাবতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিপক্ষ?---------------------------৫
গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার--৮
আল কোর'আনের দৃষ্টিতে সঙ্গীত চর্চা --১৪
মহানবীর যুগে যেসব সঙ্গীতযন্ত্র ব্যবহৃত হতো-------------------------------------১৬
অন্যান্য শিল্পচর্চা--২৪

২. **ধর্ম দেশীয় সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ নয়--২৬**
'আরবীয় সংস্কৃতি' মানেই 'ইসলামী সংস্কৃতি' নয়-------------------------------------২৭
বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি--২৯

৩. **মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও শিল্প-সংস্কৃতি------------------------------------৩২**

ভূমিকা

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে চলছে যুদ্ধ, রক্তপাত ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের বাজার সৃষ্টিতে পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো সৃষ্টি করছে যুদ্ধ উন্মাদনা। দেশে দেশে বিরাজ করছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সীমান্তে সীমান্তে চলছে সংঘাত। পরিণামে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং অর্থনৈতিক অবিচারসহ নানামুখী সংকটে জর্জরিত গোটা মানবজাতি। বর্তমানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদ ও সুদভিত্তিক ব্যবস্থা, আইন-দণ্ডবিধি হিসেবে রোমান ও ব্রিটিশ আইন ইত্যাদি মানব মস্তিষ্ক প্রসূত তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা মানবজীবন পরিচালিত হচ্ছে। অথচ মানুষের তৈরি এসব ব্যবস্থাই বিশ্বকে আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, এই মহাসংকট নিরসনে এমন কোনো জীবনব্যবস্থা কি আদৌ আছে যা গ্রহণ করলে মানুষ পরিপূর্ণ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে?

হেযবুত তওহীদ মূলত এমন একটি জীবনব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছে যা মানবজীবনে কার্যকর হলে মানুষের আত্মিক, মনোদৈহিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি যাবতীয় সংকট দূরীভূত হবে। তবে স্বাভাবিকভাবেই এমন ভারসাম্যপূর্ণ ও নিখুঁত জীবনব্যবস্থা মানুষের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর (সা.) মাধ্যমে মানবজাতির জন্য এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা পাঠিয়েছেন। সেই শাশ্বত, সনাতন, সত্য জীবনব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন ছাড়া মানবজাতির সামনে মুক্তির আর কোনো পথ নেই।

এই যৌক্তিক প্রস্তাব নিয়ে হেযবুত তওহীদ যখন মানুষের কাছে যাচ্ছে তখন এমন একটি শ্রেণির বাধার সম্মুখীন হচ্ছে যে শ্রেণিটি বহুদিন থেকেই ধর্মীয় অঙ্গনে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। তারা মানুষের ধর্মীয় জীবনে নেতৃত্ব দেন, মাদ্রাসায় পড়ে বিভিন্ন মাজহাবের অনুসারী হয়ে নিজেদের নায়েবে নবী, ওরাসাতুল আম্বিয়া বলে দাবি করেন। বিশেষ করে আমরা যখন সকল ধর্মের মানুষদের নিয়ে সর্বধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করি, ধর্মের নামে অধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলি তখন আমাদের বিরুদ্ধে এই শ্রেণিটি মিথ্যা ফতোয়া দেয়। তাদের মতে অন্য ধর্মের মানুষদের সাথে মতবিনিময় বৈধ নয়। আবার আমরা সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে, যারা চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য চর্চা এবং অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত, তাদের নিয়ে মতবিনিময় করি, তখনও এই শ্রেণিটি আমাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় যে ইসলামে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা নিষিদ্ধ, গান বাদ্যযন্ত্র, চিত্রকলা, অভিনয় ইত্যাদি হারাম। প্রকৃত সত্য এখন উদঘাটন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। পবিত্র কোর'আন কি গান, বাদ্যযন্ত্র, নাটক, চিত্রকলা, অভিনয় ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে হারাম ঘোষণা করেছে? আল্লাহর রসুলের (সা.) জীবনে কি শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা হয়নি? এই বিষয়ে প্রকৃত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? মূলত শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার বিষয়ে আল্লাহর কিতাব কোর'আন এবং রসুলের (সা.) কথা কী, ইসলামের মানদণ্ড কী তা প্রতিটি সংস্কৃতিবান এবং সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের সামনে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে দেশজুড়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ।

বর্তমানে একদিকে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি, কূপমণ্ডুকতা, অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা, ওয়াজ মাহফিলের নামে হুঙ্কার ও উস্কানিমূলক কথা বলে যাচ্ছে একটি গোষ্ঠী। অন্যদিকে এদের অযৌক্তিক, অর্থহীন কথাবার্তা-কর্মকাণ্ড দেখে আরেকটা গোষ্ঠী যারা নিজেদের সংস্কৃতিমনা, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিশীল ও আধুনিক জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করে তারা ধর্মের বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিয়ে ইসলামের বিষয়ে বিরূপ ধারণা পোষণ করছেন। ফলে এই দুইটি শ্রেণির মধ্যে বহুদিন ধরে একটি মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এই দ্বন্দ্ব বহুবার সরাসরি সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে।

তাছাড়াও আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যারা ভূমিকা রাখছেন ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচার ও ভুল ফতোয়ার প্রভাবে তারাও অনেকে এই ধারণা পোষণ করেন যে, ইসলামে সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ নেই। গান গাওয়া, অভিনয় করা ইত্যাদি হারাম। তাদের এই মনোভাব তাদের ইসলামের প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বিরাগভাজন করে তোলে।

তাই আমরা মনে করি এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অশান্তি নিরসন করতে হলে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। ইসলামে সংস্কৃতি চর্চার স্বরূপ কী, সুস্থ সংস্কৃতির মানদণ্ড কী, সংস্কৃতি চর্চার নামে অশ্লীলতা যা সভ্য সমাজকে পশ্চাৎগামী করছে সে ব্যাপারে করণীয় কী ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরাই এই বই লেখার মূল উদ্দেশ্য।

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

এমাম, হেযবুত তওহীদ

১৪ মার্চ ২০২৪, ঢাকা

শিল্প-সংস্কৃতি ও ইসলাম

মানুষ মননশীল প্রাণী। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য তাকে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করতে হয়। তাকে যেমন দেহের চাহিদা মেটাতে হয়, তেমনি মনের চাহিদাও মেটাতে হয়। মনের চাহিদা মেটাতে মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা করে আসছে। ইতিহাস থেকে যতগুলো সভ্যতার কথা আমরা জানতে পারি, সবগুলোরই প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে ধর্ম ছিল প্রধান নিয়ামক। ধর্মের প্রবর্তক নবী, রসুল বা অবতারগণের অনুপ্রেরণায় প্রগতিপ্রাপ্ত হয়ে যুগে যুগে মানুষ গড়ে তুলেছে নব নব সভ্যতা। আর শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ছিল প্রত্যেক সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই ধর্ম কখনও শিল্প-সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ হতে পারে না, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক। ধর্ম অর্থাৎ জীবনব্যবস্থা একটি সমাজে শান্তি, ন্যায়, সুবিচার ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। আর এমন পরিবেশই মানুষের শিল্পকলার চর্চা, সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা ও জ্ঞানসাধনার পূর্বশর্ত।

ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতার জন্য একেক এলাকার পোশাক-আশাক, উৎসব, সঙ্গীত তথা সংস্কৃতি একেক রকম হয়। আল্লাহর পাঠানো শেষ জীবনব্যবস্থা ইসলাম যদিও আরবের মরু এলাকায় এসেছে, কিন্তু এটি এসেছে সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতির জন্য। পৃথিবীর সকল এলাকার ভূ-প্রকৃতি ও মানুষের পেশা যেহেতু একরকম নয়, সেহেতু বিভিন্ন এলাকার সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকবে - এমনটাই স্বাভাবিক। আর যিনি প্রকৃতির স্রষ্টা তিনি কখনও মানুষের জন্য অপ্রাকৃতিক কোনো বিধান দিতে পারেন না। তাই ইসলামের সকল বিধান সকল এলাকার মানুষের জন্য প্রয়োগযোগ্য, আলো বাতাস পানির মতো স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখি আমাদের সমাজে যারা আলেমে দীন বলে পরিচিত তারা ওয়াজ মাহফিলে ফতোয়া দিচ্ছেন গান গাওয়া হারাম, বাদ্যযন্ত্র বাজানো হারাম, ছবি তোলা-আঁকা হারাম, ভাস্কর্য তৈরি করা হারাম, অভিনয় করা হারাম, নৃত্যচর্চা হারাম, পহেলা বৈশাখে মেলায় যাওয়া হারাম, নবান্ন উৎসব করা হারাম, শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া হারাম, জন্মদিন পালন করা হারাম, টিভি দেখা হারাম, সিনেমা-নাটক দেখা হারাম। বিষয়টি এই ফতোয়ার মধ্যেই সীমিত থাকে না। অনেক সময় এসব ফতোয়া বাস্তবায়ন করার জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে হামলাযজ্ঞ চালানো হয়। যশোরে উদীচীর কার্যালয়ে বোমা হামলা, রমনার বটমূলে ছায়ানটের পহেলা বৈশাখের সঙ্গীতানুষ্ঠানে বোমা হামলা, ময়মনসিংহের চারটি সিনেমা হলে সিরিজ বোমা হামলা, সাতক্ষীরায় একটি সিনেমা হল ও স্টেডিয়ামে সার্কাস প্রদর্শনীর উপর বোমা হামলা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগ, সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে লালনের ভাস্কর্য, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য এমন কি বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ও ম্যুরাল ভাঙচুর ইত্যাদি ঘটনা এই বার্তাই দেয় যে, ইসলাম বুঝি যাবতীয় দেশজ ঐতিহ্য, শিল্প ও সংস্কৃতির শত্রু।

এই জাতীয় ফতোয়া মুসলমানদের মনে-মগজে এমন দৃঢ়মূল হয়ে গেছে যে তাদের মধ্যে যারা শিল্পচর্চা করতে চান তারা অনেক সময় নিজ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের কাছেই বাধার সম্মুখীন হন। সেই বাধাকে অতিক্রম করে অনেকেই তাদের শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকে অব্যাহত রাখলেও সব সময় নিজেকে এজন্য গোনাহগার, পাপী বলে জানেন। পাপবোধ ও সংশয় তাদেরকে ঘিরে রাখে। এহেন হীনম্মন্যতার দরুন তারা শিল্পসাধনায় পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতে পারেন না, ফলে নিজেদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও প্রতিভাকে পূর্ণরূপে বিকশিতও করতে পারেন না। শেষ বয়সে গিয়ে তারা নাচ, গান, অভিনয় ছেড়ে দিয়ে তওবা করে ভীষণ পরহেজগার বনে যান, পাপমুক্তির জন্য মসজিদ মাদ্রাসায় দান করতে শুরু করেন, নারী হলে কালো বোরকা পরে আপাদমস্তক আবৃত করে কঠিন পর্দা করতে শুরু করেন।

বাস্তবেই কি ইসলাম যাবতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিপক্ষ

এটা জানতে হলে প্রচলিত ফতোয়ার উপর থেকে অন্ধবিশ্বাস একপাশে সরিয়ে রেখে ইসলামের মূল গ্রন্থ কোর'আন এবং রসুলাল্লাহর আদর্শের (সুন্নাহ) দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং নিজেদের আল্লাহপ্রদত্ত যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগাতে হবে। হালাল ও হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি হলো, আল্লাহ যা হারাম করেন নি তা হালাল। আর রসুল (সা.) নিজেই বলেছেন আল্লাহর বাণী হচ্ছে কোর'আন যা অবিকৃত রয়েছে এবং থাকবে। রসুলাল্লাহর (সা.) নামে অগণিত জাল হাদিস বাজারে চালু আছে, কিন্তু কোর'আনের একটি আয়াতও জাল করা সম্ভব না। তাই কোর'আন হচ্ছে ইসলামের নামে প্রচলিত যে কোনো ধারণাকে মূল্যায়ন করার মানদণ্ড। আল্লাহ কোর'আনে গুটিকয় কাজ, খাদ্য ও বিষয় হারাম করেছেন। তিনি বলেন, **"আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, হারাম করেছেন আল্লাহর অবাধ্যতা, অসঙ্গত বিরোধিতা ও অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না** (সুরা আরাফ ৩৩)।

এখানে চারটি বিষয়কে হারাম করা হচ্ছে। এক- অশ্লীলতা (indecency)। দুই- আল্লাহর নাফরমানি অর্থ আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধানের লংঘন করা, তিন- অন্যায়, অত্যাচার, অসঙ্গত বিরোধিতা (unjustifiable aggression), চার- আল্লাহর সঙ্গে শেরক করা। এই তিনটি কাজ না করে যে কোনো কাজ, সেটা শিল্পচর্চা হোক কি দৈনন্দিন জীবনের যে কোনো কাজ তা ইসলাম পরিপন্থী বা নাজায়েজ কাজ হতে পারে না। আর আল্লাহর রসুল ছিলেন জীবন্ত কোর'আন। তিনি তাঁর নব্যুয়তি জীবনে এমন কিছু করতে পারেন না যা কোর'আনের হুকুম পরিপন্থী। আমরা এখন একটা একটা করে দেখব, কোর'আনে কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও শিল্পচর্চাকে হারাম করা হয়েছে কিনা।

Say, 'My Lord has only forbidden indecencies, open or secret and sin and unjustifiable aggression and that you associate with ALLAH that for which HE has sent down no authority, and that you say of ALLAH what you know not.' (Sura Araf 33)

চিত্রনায়িকা নূতন

ফেরদৌস ওয়াহিদ

শাহাদাত হোসেন নিপু

১৭-৭-২০২৩ রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমীর সঙ্গীত ও নৃত্যকলা মিলনায়তনে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক পরিষদ (বাসাপ) এর উদ্যোগে 'সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে শিল্পী সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন হেযবুত তওহীদের চেয়ারম্যান এমাম হোসাইন মোহম্মদ সেলিম। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড এর চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমীর পরিচালক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. শাহাদাৎ হোসেন নিপু। সভা শেষে দেশবরেণ্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে গান, আবৃত্তি, নাটক প্রদর্শিত হয়।

২২ জানুয়ারি ২০২১ তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত একটি রিসোর্টে বনভোজনের আয়োজন করে হেযবুত তওহীদের ঢাকা মহানগরী শাখা। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। দিনব্যাপী খেলাধুলার নানা আয়োজনের পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নিয়মিত শিল্পী খন্দকার নাজমুল আলম শান্ত।

৪ মার্চ ২০২৪ইং ‘সংস্কৃতি চর্চার হাত ধরে আসুক নবজাগরণ’ এই স্লোগানে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে রংপুরের প্রাণকেন্দ্র শহীদ মিনার চত্বরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীরাও গান পরিবেশন করেন।

গান ও বাদ্যযন্ত্রের **ব্যবহার**

রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, তোমরা এই বিবাহের ঘোষণা দাও। এটা মসজিদে সম্পন্ন করো এবং বিবাহ উপলক্ষে দফ বাজাও।

-ইবনে মাজাহ হাদিস নং- ১৮৯৫, তিরমিযী হাদিস নং- ১০৮৯

সঙ্গীত সব যুগে সব জাতির সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সঙ্গীত ছিল না এমন কোনো সভ্যতা মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু আদর্শহীনতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের দরুন সামাজিক জীবনে যে অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ ঘটে, তেমনি ঘটে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও। এ কারণে ইসলামপূর্ব আরবে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে সঙ্গীত ও কাব্যচর্চার মধ্যে অশ্লীলতা চরম আকার ধারণ করেছিল। তখন তো আজকের মতো গান রেকর্ড করার যন্ত্রপাতি ছিল না, গান শোনার একমাত্র পথই ছিল শিল্পীদের সামনে বসে শোনা। এজন্য ধনী ব্যক্তিরা সে যুগে গায়িকা ও বাইজিদের নিজ খরচে ভরণপোষণ করতো। তাদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। ধনীরা দাসের বাজার থেকে গায়িকাদের কিনে আনত। তাদের দাম ছিল অন্য দাস-দাসীদের চেয়ে বেশি। এই অমানবিকতা ও জাহেলিয়াত থেকে সমাজকে মুক্ত করেছিল ইসলাম। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, **তোমরা গায়িকা ক্রয়-বিক্রয় কর না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। আর এসবের ব্যবসায় (দাস ব্যবসায়) কোনো কল্যাণ নেই। জেনে রেখ, এর প্রাপ্ত মূল্য হারাম।** ***-জামে তিরমিযী হাদীস : ১২৮২; ইবনে মাজাহ হাদীস : ২১৬৮।***

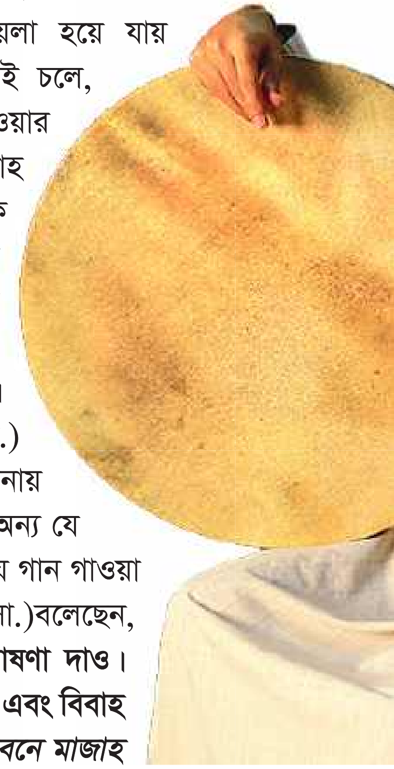

একটি পোশাক যখন ময়লা হয়ে যায় তখন সেটাকে ধুয়ে নিলেই চলে, পোশাক ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। রসুলাল্লাহ যখন আরবের মানুষকে সত্যদীনের শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন তখন তাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকেও অশ্লীলতামুক্ত করলেন। রসুলাল্লাহর (সা.) উপস্থিতিতেও মদীনায় সাহাবীদের বিয়ে শাদি বা অন্য যে কোনো উৎসবে দফ বাজিয়ে গান গাওয়া হতো। আল্লাহর রসুল (সা.)বলেছেন, **'তোমরা এই বিবাহের ঘোষণা দাও। এটা মসজিদে সম্পন্ন করো এবং বিবাহ উপলক্ষে দফ বাজাও।'** ***(ইবনে মাজাহ হাদিস নং- ১৮৯৫, তিরমিযী হাদিস নং- ১০৮৯)***

এমন কি একটি হাদিসে এও বলা হয়েছে যে, **'হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী হলো- বিয়ের সময় দফ বাজানো এবং তা জনসম্মুখে প্রচার করা।'** ***(তিরমিযী হাদীস নং- ১০৮৮; নাসাঈ হাদীস নং- ৩৩৬৯; ইবনে মাজাহ হাদীস নং -১৮৯৬)*** সুতরাং মসজিদে বিয়ে সম্পন্ন করা এবং বিয়েতে গান-বাজনা করা রসুলাল্লাহর হুকুম।

জাহেলী যুগে আরবের ধনী ব্যক্তিরা গায়িকা ও বাইজিদের নিজ খরচে ভরণপোষণ করতো। এমনকি তাদের সঙ্গে ব্যভিচারেও লিপ্ত হতো।

রসুলাল্লাহর (সা.) নারী সাহাবি রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনু আফরা (রা.) বলেন, **"আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী (সা.) এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার কাছে বসে আছ। সে সময়ে মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত আমার বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা গাচ্ছিল। তাদের একজন গাচ্ছিল, আমাদের মধ্যে এক নবী আছেন, যিনি ভবিষ্যৎ জানেন। তখন রসুলুল্লাহ্ বললেন, এ কথাটি বাদ দাও, আগে যা গাইছিলে তাই গাও"** ***(সহিহ বোখারী, হাদিস নং ৫১৪৭)***। লক্ষ করুন, এখানে রসুলাল্লাহ (সা.) মেয়েদেরকে গান গাইতে বারণ করলেন না, কিন্তু তাঁর ব্যাপারে একটি মিথ্যা ধারণা তিনি সংশোধন করে দিলেন। আমাদের ধর্মীয় অঙ্গনে যুক্তিবুদ্ধির চর্চা এতটাই উঠে গেছে যে, এক শ্রেণির মুফতি এও বলে থাকেন যে সব বাদ্যযন্ত্র হারাম, কেবল দফ হালাল, কারণ সাহাবিরা দফ বাজাতেন। প্রকৃত বিষয় হলো, সে যুগে আজকের মতো এত সব বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ছিল কেবল দফ, তাম্বুরা ইত্যাদি। সেগুলোই তারা বাজাতেন।

"

হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী হলো- বিয়ের সময় দফ বাজানো এবং তা জনসম্মুখে প্রচার করা।

-(তিরমিযী হাদীস নং- ১০৮৮; নাসাঈ হাদীস নং- ৩৩৬৯; ইবনে মাজাহ হাদীস নং -১৮৯৬)

প্রাচীন কাল থেকেই আরব দুনিয়াতে বিয়েতে দফ বাজিয়ে, নেচে গেয়ে অনুষ্ঠান করা হতো। বিয়ের পর বর কনেকে নিয়ে একটা শোভাযাত্রাও হত। রসুলাল্লাহ (সা.) আরবের এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে নাকোচ করে দেননি। কেবল সতর্ক করেছেন যেন অনুষ্ঠানের নামে কোনো অশ্লীলতা বা আল্লাহর নাফরমানিমূলক কর্মকাণ্ড না করা হয়। তিনি বলেছেন বিয়ে হবে মসজিদে আর এতে অবশ্যই দফ বাজাতে হবে। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নবদম্পতিকে অভিনন্দিত করা এবং তাদের এই বিবাহ সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা।

১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে রাজধানীর শিশু একাডেমিতে দৈনিক বজ্রশক্তির ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, অভিনেতা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বিচারপতিসহ বিশিষ্ট নাগরিকগণ।

ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

ড. এনামুল হক

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির প্যানেলে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রয়াত নাট্যজন ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক ড. এনামুল হক ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ।

নাদের চৌধুরী

আফজাল শরীফ

দেওয়ান মো. হাফিজ

পি আর বড়ুয়া

কবি ফরিদা মজিদ

বরুণ ভৌমিক নয়ন

তামান্না রহমান

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন বিশিষ্ট অভিনেতা জনাব নাদের চৌধুরী, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা জনাব আফজাল শরীফ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির এমপ্লয়ার এস্যোসিয়েশনের সভাপতি জনাব দেওয়ান মো. হাফিজ, ঢাকা সাংবাদিক ফোরামের সহ-সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক বরুণ ভৌমিক নয়ন, নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রয়াত কবি ফরিদা মজিদ, প্রাক্তন উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) জনাব পি আর বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের প্রভাষক তামান্না রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীদের পরিবেশনা ছাড়াও ছিল শিশুশিল্পীদের দলীয় নৃত্য ও অতিথি শিল্পীদের পরিরেবশনা।

৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অধীন মাটি মিউজিক আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সঙ্গীত, নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশন করে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীরা।

২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে রাজধানীর সূত্রাপুরে অবস্থিত জহির রায়হান হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। সারাদেশের বিভিন্ন শাখা থেকে আগত সদস্য-সদস্যাগণ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নাটিকা ইত্যাদি পরিবেশন করেন।

২৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে ফেনী শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান শুসেন চন্দ্র শীল। মাটি'র ফেনী জেলা সভাপতি মঞ্জুর বিন সুলতানের সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি রিয়াদুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এড. প্রিয় রঞ্জন দত্ত প্রমুখ।

৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে রাজধানীর কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় নারী সম্মেলনের আকর্ষণীয় অংশ ছিল জাদু প্রদর্শনী, সঙ্গীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি ইত্যাদি নানাবিধ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

১০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে রাজধানীর তেজগাঁও কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব তাফাজ্জল হোসেন, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রয়াত অভিনেতা জনাব এটিএম শামসুজ্জামান, প্রিন্সিপাল আব্দুর রশিদ এমপি, লালনগীতি শিল্পী ফরিদা পারভিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে হেযবুত তওহীদের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীদের নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীতের পর লালনসম্রাজ্ঞী ফরিদা পারভীনের অনবদ্য পরিবেশনা সকলকে মুগ্ধ করে।

"ধর্মব্যবসায়ী ও পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের যোগফল জঙ্গিবাদ - উত্তরণের একমাত্র পথ" বইয়ে হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম জঙ্গিবাদের করাল থাবা থেকে দেশ ও মানবজাতিকে মুক্ত করার পন্থা তুলে ধরেছেন। বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব ফজলে হোসেন বাদশাহ এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক দেশেরপত্রের সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক গান পরিবেশন করে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীরা।

সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র যদি হারামই হতো তাহলে পবিত্র কোর'আনে কি আল্লাহ একটি আয়াতেও সেটা উল্লেখ করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু তিনি কোথাও এ জাতীয় কোনো কথাই বলেন নি।

আল কোর'আনের দৃষ্টিতে সঙ্গীত চর্চা

মুসলিম ফিকাহ এবং আইনশাস্ত্রের এক মূলনীতি এই যে, যা হারাম করা হয় নি বা অবৈধ ঘোষণা করা হয় নি তা বৈধ।

কী কী কাজ অবৈধ তা নির্ধারণ করার জন্য কোর'আন ও রসুলাল্লাহর (সা.) সুন্নাতের আশ্রয় নিতে হয়। মদ, সুদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদিকে যেভাবে কোর'আনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সেভাবে সঙ্গীতের অবৈধতাসূচক সুস্পষ্ট কোনো আয়াত কোর'আনে নেই। এমন কি এগুলো সম্বন্ধে নেতিবাচক কোনো কথাও কোর'আনে নেই। রসুলাল্লাহর যুগে আরব দেশে প্রচলিত অনেক সামজিক আচার, প্রথা, অনুষ্ঠান প্রভৃতির অনেক কিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র যদি হারামই হতো তাহলে পবিত্র কোর'আনে কি আল্লাহ একটি আয়াতেও সেটা উল্লেখ করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু তিনি কোথাও এ জাতীয় কোনো কথাই বলেন নি।

তথাপি দীনের অতিবিশ্লেষণ করে সুরা লোকমানের ৬ নম্বর আয়াতকে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে,

"যেখানে আল্লাহ সঙ্গীত শব্দটিই বলেন নি, বলেছেন অসার কথাবার্তা। আল্লাহ বলেন, **"একশ্রেণির লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অজ্ঞানতাবশত 'লাহওয়াল হাদীস' (অনর্থক, অবান্তর, অসার, অপ্রয়োজনীয় গল্পগুজব বা বাক্য) সংগ্রহ করে এবং আল্লাহর পথকে হাসি-তামাশারূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।"** বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামী গবেষক ও বহু গ্রন্থের লেখক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক মহাপরিচালক এ জেড এম শামসুল আলম তার 'মুসলিম সঙ্গীত চর্চার সোনালি ইতিহাস' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

তিনি লিখেছেন, "এ আয়াতে উল্লেখিত লাহ্ওয়া শব্দের অর্থ ব্যাপক। এর অর্থ খেলা, তামাশা, অসার কথা, অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ, অনর্থক কাজ ইত্যাদি যা মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে সরিয়ে রাখে অথবা বিরত রাখে। সঙ্গীতের জন্য আরবি ভাষায় পৃথক শব্দ আছে। ওপরের আয়াতে যদি সঙ্গীতের নিষেধাজ্ঞাই উদ্দেশ্য হতো, তবে গানের অর্থবোধক আরবি শব্দ যেমন 'গিনা' বা 'সামা', 'নাগমা' প্রভৃতিই ব্যবহৃত হতো।"

তিনি আরো লিখেছেন, "উপরের আয়াতটি সূক্ষ্মভাবে দেখলে আমরা লক্ষ্য করি, লাহওয়াল হাদিস বা অসার কথা, অপ্রয়োজনীয় গল্পগুজব ক্রয় করার নিন্দা করা হয়েছে, যখন সেটা আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। দিনের ক্লান্তি শেষে অফিস ফেরত পিতা অথবা পিতামহ যদি সন্তানের বা আওলাদের গান শুনে আনন্দ পেতে চান, তাহলে কাউকে পথভ্রষ্ট করা হয় না।... নির্দোষ, নির্মল আনন্দের জন্য যৌন আবেদন বা অশ্লীলতাহীন সঙ্গীতচর্চা মানুষকে ন্যায়পথ থেকে ভ্রষ্ট করে না।"

আর সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়, সঙ্গীত আর অসার কথাবার্তা এক বিষয় নয়। সঙ্গীতের বাণী তো শিক্ষামূলকও হতে পারে, সুন্দর সমাজ ও মানবতাবোধের বাণীও সঙ্গীতে ধ্বনিত হতে পারে। নয়তো আজান কেন সুর করে দেওয়া হয়? কোর'আন কেন সুর করে পড়া হয়? ওয়াজ কেন সুর করে করা হয়? তাছাড়া তাছাড়া আসমানি কেতাববাহী প্রধান চারজন রসুলের অন্যতম **দাউদ (আ.) এর মো'জেজাই ছিল তাঁর সুরেলা কণ্ঠ। তিনি বীণার মত একটি বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন যার নাম হার্প (Harp)। হার্প হাতে দাউদ (আ.) এর ছবি ঐ সময়ের মুদ্রাতেও অঙ্কিত ছিল, এখনও অনেক ভাস্কর্য রয়েছে যাতে এভাবেই তাঁকে তুলে ধরা হয়েছে।** তিনি বলতেন, On the harp I will praise you o God (Old Testament – Psalm 43.4). অর্থাৎ- আমি বীনার দ্বারা তোমার গুণগান করি হে প্রভু।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- **'এক রাতে রসুল (সা.) হজরত আবু মুসা আশআরির (রা.) কোরআন তিলাওয়াত শুনে দাঁড়িয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতে থাকেন। তারপর তিনি বলেন, তাঁকে তো হজরত দাউদের মিষ্টি সুরের কিছু অংশ দান করা হয়েছে।'** (সহি মুসলিম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৪৬)। দাউদ (আ.) তাঁর সুরেলা কণ্ঠে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'দাউদের প্রতি আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম এই মর্মে যে- হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং (একই নির্দেশ দিয়েছিলাম) পাখিদেরও।' (সুরা আস-সাবা, আয়াত ১০)

বাদ্যযন্ত্র 'হার্প' হাতে দাউদ (আ.) এর ভাস্কর্য

মহানবীর যুগে যেসব সঙ্গীতযন্ত্র ব্যবহৃত হতো

> **আবু মুসা আল আশ'আরী (রা.) এর কণ্ঠে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, "তাকে তো দাউদ পরিবারের বাদ্যগুলোর একটি বাদ্য দেওয়া হয়েছে।"**
>
> -(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খণ্ড - ইবনে কাসীর)

মহানবীর যুগে কতকগুলো সঙ্গীতযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। তাঁর সম্মুখে যখন ওগুলো বাজানো হয় তখন তিনি তা নিষেধ করেন নি। বিশিষ্ট সাহাবী আবু মুসা আল আশ'আরী (রা.) সমকালীন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। আবু উসমান নাহদি বলেছেন যে, আবু মুসা (রা.) এর কণ্ঠস্বরের চাইতে মধুর কোনো সেতারা-দোতারা কিংবা বাঁশির সুর আমি শুনি নি। **রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, "একে তো দাউদ পরিবারের বাদ্যগুলোর একটি বাদ্য দেওয়া হয়েছে।"** (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খণ্ড - ইবনে কাসীর)

পবিত্র কোর'আনের আরেকটি আয়াতের অপব্যাখ্যা করে গান হারাম হওয়ার মাসআলা নির্গত করা হয়। সেটা হচ্ছে সুরা বনি ইসরাইলের ৬৩-৬৪ নম্বর আয়াত। আয়াতটিতে আল্লাহ শয়তানকে তাঁর নৈকট্য থেকে বিতাড়িত করার প্রসঙ্গটি বর্ণনা করছেন। তিনি শয়তানকে বলছেন, "এখান থেকে চলে যা। অতঃপর তাদের (আদমসন্তান) মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি-পূর্ণ শাস্তি। তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় 'আওয়ায' দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।"

পবিত্র কোর'আনের অনুবাদকগণ এই আয়াতে উল্লেখিত 'সাওত' শব্দটির অনুবাদ করেছেন, কণ্ঠ, আওয়াজ, শব্দ, আহ্বান ইত্যাদি। কেউই 'সাওত' শব্দের বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদে এর অর্থ 'গান' করেন নি। তথাপি বহু ব্যাখ্যাকার জোর করে একে 'গান-বাজনার শব্দ' বলেই সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আয়াতটিতে বলা হচ্ছে শয়তান যেন মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে পথভ্রষ্ট করার জন্য চেষ্টা করে। ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়েও তো শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে, তাই নয় কি? আমাদের ধর্মীয় বক্তারাই একে অপরকে পথভ্রষ্ট, বেদাতি, বাতিল, কাফের ইত্যাদি বলে ফতোয়া দিচ্ছেন। তারা কি গান-বাজনা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছেন? অবশ্যই না। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছেন ইসলামেরই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা। সহজ কথায় আল্লাহর হুকুম থেকে, সহজ সরল জীবনবিধান থেকে ভ্রষ্ট করে বিকল্প হুকুম ও জীবনবিধানের দিকে মানুষকে ধাবিত করার জন্য শয়তান নানা বিকল্প চিন্তাধারা, মতবাদ, কথা, আদর্শ ইত্যাদির দিকে আহ্বান করতে পারে। এসবই হচ্ছে শয়তানের আহ্বান, শয়তানের আওয়াজ অর্থাৎ সাওত। অবশ্য সেটা গানও হতে পারে, কবিতাও হতে পারে, যে কোনো সাহিত্যও হতে পারে। এ সবই নির্ভর করছে সেগুলোর বক্তব্যের উপরে। যদি কোনো গানের কথাগুলো আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য রচিত হয় তাহলে সেগুলো নিঃসন্দেহে শয়তানের আওয়াজ। যদি তা না হয় তাহলে অবশ্যই সেই গান-বাদ্যকে শয়তানের আওয়াজ বলার কোনো সুযোগ নেই।

সুতরাং আল্লাহ যেমন সঙ্গীত হারাম করেন নি, তেমনি রসুলাল্লাহও (সা.) সঙ্গীত চর্চাকে নিষিদ্ধ করেন নি। কিন্তু তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসের ব্যস্ততম পুরুষ, যিনি মানবজীবনের সর্ব অঙ্গনের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য এক মহান বিপ্লব সম্পাদন করেছেন, যাকে মাত্র ৯ বছরে ১০৭ টি ছোট বড় যুদ্ধাভিযানের আয়োজন করতে হয়েছিল। এমন এক মহা বিপ্লবীর গান নিয়ে পড়ে থাকার অবসর ছিল না। কিন্তু হাদিসে পাওয়া যায় অবসরে নিজ গৃহে অথবা যুদ্ধ থেকে ফিরে সাহাবিদের সঙ্গে তাঁকে গান শুনতে দেখা গেছে।

আমরা জানি যে গান কায়িক পরিশ্রমের একঘেয়েমি দূর করে ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করে। এজন্য আমাদের মাঝিমাল্লারা ভাটিয়ালি গান, সারি গান করেন; গাড়োয়ানরা ভাওয়াইয়া গান করেন। আরবের বা রাজস্থানের মরুভূমির উটের রাখালরাও 'হুদি গান' নামে একপ্রকার গান করে থাকেন।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, একবার রসুলাল্লাহ কোনো এক সফরে যাচ্ছিলেন। জনৈক উট চালক উটের রশি ধরে হেঁটে যাচ্ছিল আর 'হুদি' গান গাচ্ছিল, আর উটগুলোকে আরো জোরে চলার জন্য তাড়া দিচ্ছিল। উটের পিঠে আরোহী ছিলেন রসুলাল্লাহর স্ত্রীগণ। স্ত্রীগণের উটটি রসুলাল্লাহর উটকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তখন তিনি গায়ককে লক্ষ্য করে বললেন, আনযাশাহ! সাবধানে চলো; এই কাচের পাত্রদের সঙ্গে কোমল আচরণ করো। (মুসনাদে আহমদ, ৩:১৭২, ১৮৭, ২০২)। তিনি রসিকতার ছলে নারীদের যেন কষ্ট নয় হয় সেজন্য উট আস্তে চালাতে বললেন, কিন্তু বললেন না যে, গান গেয়ো না। গান হারাম।

রসুলাল্লাহ যখন হেজরত করে মদিনায় এসে পৌঁছান তখন তাঁকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আনসার নারী পুরুষ শিশু কিশোর নির্বিশেষে দফ বাজিয়ে "তালা-আল বাদরু আলাইনা - 'সানইয়াতুল বিদা' হতে আমাদের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করতে থাকবে, আমাদের ওপর ওয়াজিব তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।" গানটি গাইতে থাকেন। গানটি আজও মিলাদে গাওয়া হয়।

আমাদের দেশের শ্রমিকরা কাজের তালে তালে শ্রম লাঘব করার "হেইয়ো হো- হেইয়ো হো" ইত্যাদি ধ্বনি ব্যবহার করে একপ্রকার শ্রমসঙ্গীত করে থাকেন। আরবে এই সঙ্গীতকে বলে রাজস্। মদিনায় এসে মসজিদে নববী নির্মাণের সময় আল্লাহর রসুল (সা.) স্বয়ং এই শ্রমসঙ্গীত গেয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীরাও গান গেয়েছিলেন। আনাস (রা.) বলেন, রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ মসজিদ নির্মাণের সময় খেজুর গাছগুলোকে কেবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে স্থাপন করলেন। চৌকাঠের দুই বাহুতে স্থাপন করলেন পাথর। রসুলাল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা তখন 'রাজস্' তথা কর্মসঙ্গীত গাচ্ছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, হে আল্লাহ! আখেরাতের মঙ্গলই প্রকৃত মঙ্গল। আপনি সাহায্য করুন আনসার ও মোহাজিরদের। -বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ (৪/১৩৬, হাঃ ২৪১৯), ইবনু খুযাইমাহ (৯১৭৭৫)।

খন্দকের যুদ্ধের সময় হযরত সালমান ফারসির পরামর্শে সাহাবীদের নিয়ে মদীনাকে কোরাইশদের হামলার হাত থেকে রক্ষা করতে রসুল (সা.) যখন মদীনার তিন দিকে খন্দক (গর্ত) করছিলেন তখন সবাই সমস্বরে গান গাইতে গাইতে খনন কাজ করছিলেন। সুতরাং সৎকাজের উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য গান গাওয়াকে রসুলাল্লাহর সুন্নাহ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

বারা ইবনু আযিব (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খন্দক যুদ্ধের দিন দেখেছি, তিনি স্বয়ং মাটি বহন করেছেন। এমনকি তাঁর সমগ্র বক্ষদেশের কেশরাজিকে মাটি আবৃত করে ফেলেছে আর তাঁর শরীরে অনেক পশম ছিল। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনু রাওহায়া (রাঃ) রচিত কবিতা অবৃত্তি করছিলেন- 'হে আল্লাহ আপনি যদি আমাদেরকে পথ না দেখাতেন, তাহলে আমরা পথ পেতাম না। আর আমরা সাদকা করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। আপনি আদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদেরকে অবিচল রাখুন। শত্রুগণ আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, যখন তারা ফিৎনা সৃষ্টির সংকল্প করেছে, আমরা তা অস্বীকার করেছি।' আর তিনি এ কবিতাগুলো অবৃত্তিকালে স্বর উঁচু করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ সুর পছন্দ করেন, তাই কোর'আন সুর করে তেলাওয়াত করতে উৎসাহিত করা হয়, সুর করে আযান দেওয়া হয়। তেমনি সুর করে কবিতা আবৃত্তিও ছিল আরবের সংস্কৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ।

> **"হে আল্লাহ!**
> **আখেরাতের মঙ্গলই প্রকৃত মঙ্গল। আপনি সাহায্য করুন আনসার ও মোহাজিরদের।"**
>
> -সাহাবিদের সাথে রসুল (সা.) এর গাওয়া গান
> রাজস্ (কর্মসঙ্গীত)

জাহেলিয়াতের যুগে আরবে গান আর অশ্লীলতা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই অনেক সাহাবি গানকেই ফাহেশা কাজ বা মন্দ কাজ বলে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু রসুলাল্লাহ (সা.) তাঁদের এই ভুল ধারণা ভাঙিয়ে দিলেন। আম্মা আয়েশা (রা.) খুব সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁর গৃহে রসুলাল্লাহর (সা.) উপস্থিতিতেই সঙ্গীত চর্চা তারই দৃষ্টান্ত। *(সহিহ বোখারী, হাদিস নং ৯৮৭)।*

◇ একবার আরবের একটি জাতীয় উৎসবের দিন ‘বুয়াস দিবস’- এ দুটো মেয়ে রসুলাল্লাহর ঘরে দফ ও তাম্বুরা বাজিয়ে গান গাইছিল। আম্মা আয়েশাও (রা.) গান শুনছিলেন। এমন সময় তাঁর পিতা আবু বকর (রা.) সেখানে আসেন এবং আম্মা আয়েশাকে (রা.) তিরস্কার করেন। তখন আল্লাহর নবী আবু বকরের (রা.) দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আবু বকর! তাদেরকে তাদের কাজ করতে দাও” (সহিহ বোখারী, হাদিস নং ৯৮৭)।

◇ আয়েশা (রা.) একটি মেয়েকে লালন পালন করতেন। অতঃপর তাকে এক আনসারের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানস্থল থেকে আয়েশা (রা.) এর প্রত্যাবর্তনের পর রসুলাল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি মেয়েটিকে তার স্বামীর বাড়িতে রেখে এসেছো?” উত্তরে তিনি বললেন, “হ্যাঁ”। পুনরায় রসুল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি এমন কাউকে তাদের বাড়ি পাঠিয়েছ যে গান গাইতে পারে?” আয়েশা (রা.) বললেন, “না”। রসুলাল্লাহ (সা.) বললেন, “তুমি তো জানো আনসাররা অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়” (ইকদ আল ফরিদ। হাদিস নং- ৪৭৮৫, বুখারি শরিফ, ৮ম খণ্ড। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৪৪৫)।

◇ আবু বোরায়দা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (স.) কোনো একটি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী সাহাবী মহানবী (স.) এর সামনে এসে বললেন যে- ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি মানত করেছিলাম যে, আপনাকে নিরাপদে আল্লাহ ফিরিয়ে আনলে আমি আপনার সামনে দফ বাজিয়ে গান গাইব।’ মহানবী (স.) বললেন, ‘যদি তুমি মানত করে থাক তাহলে বাজাও। মানত পূর্ণ কর। তারপর মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান গাইতে লাগল।’ [তিরমিজি ২য় খণ্ডের ২০৯-২১০ পৃষ্ঠা, মেশকাত শরিফের ৫৫৫ পৃষ্ঠা ও আবু দাউদ শরিফ]

০৭ ডিসেম্বর ২০২৩ইং চাঁদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।

বর্ণিত ঘটনাগুলোতে কয়েকটি বিষয় ভালো করে লক্ষ করে দেখুন:

- যে ঘরে গান হচ্ছে সেটি স্বয়ং রসুলাল্লাহর (সা.) ঘর
- ঘরে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন
- তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রা.) সঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন
- মেয়েরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান করছিল
- গানগুলো মদীনাবাসীর জাতীয় উৎসবের সাথে সম্পর্কিত গান তা কোনো ইসলামিক হামদ-নাত ছিল না, কিন্তু ইসলামের সীমারেখা অতিক্রম না করায় রসুলাল্লাহ (সা.) সেগুলোর অনুমতি দিলেন
- বুয়াস দিবস অর্থাৎ আরবের কোনো আঞ্চলিক ঐতিহাসিক দিবস। সেটাও ইসলামিক কোনো অনুষ্ঠান ছিল না।
- গান যদি নিষিদ্ধ হতো তাহলে রসুলাল্লাহ (সা.) নিশ্চয়ই উক্ত নারী সাহাবিকে নিষিদ্ধ মানত পুরণ করতে দিতেন না।

এগুলো হচ্ছে রসুলাল্লাহর জীবনের ঘটনা। তাঁর এন্তেকালের পর সাহাবিগণও তাঁর এই সুন্নাহর কথা জাতিকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিতেন। ইয়াদ আল আশ'আরী (রা.) একদিন আম্বার নাম এলাকায় ঈদের সালাতে উপস্থিত হন। ঈদের ময়দানে কেউ দফ বাজাচ্ছিল না দেখে তিনি প্রশ্ন করেন যে, আমি তোমাদেরকে দফ বাজাতে দেখছি না কেন, যেমনটা রসুলাল্লাহর (সা.) সামনে বাজানো হতো? সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ১৩০২

আল্লাহর রসুলের যুগে মুসলিমরা বিভিন্ন আনন্দ উদযাপনে দফ বাজিয়ে নাচ ও গান করতেন। অশ্লীলতা ও আল্লাহর নাফরমানি হয় এমন সমস্ত বিষয়কে শিল্পচর্চা থেকে বয়কট করা হয়েছিল। ফলে একটি পবিত্র সাংস্কৃতিক ধারা সমাজে প্রচলিত হয়েছিল।

দুঃখজনক ইতিহাস হচ্ছে, রসুলাল্লাহর (সা.) ওফাতের অর্ধশতাব্দী না যেতেই খেলাফত পুরোপুরি রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। শাসকগোষ্ঠী দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে বিশ্বের অপরাপর রাজা বাদশাহদের মতই ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়েন। ভোগ-বিলাসের উপাচার হিসাবে আবার চালু হয় মদ্যপান, দাস প্রথা, দাসী-নর্তকীদের অশ্লীল নাচ-গান। ধীরে ধীরে এই অপসংস্কৃতি আমির ওমরাহদের মাধ্যমে সমাজে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। গানের সঙ্গে যৌনতা, ব্যভিচার, আল্লাহর নাফরমানি, মদ্যপান এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল যে সঙ্গীতচর্চাকে সেসব দূষণ থেকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। একটা পর্যায়ে সমসাময়িক আলেম সমাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হন। তারা এসব অপসংস্কৃতিকে বন্ধ করতে গিয়ে অশ্লীলতার বিরোধিতা না করে সরাসরি গানকেই হারাম বলে ফতোয়া দিলেন। তারা বুঝলেন না, মাথা ব্যথার সমাধান কখনো মাথা কেটে ফেলা নয়। আল্লাহ তো অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন, গানকে নয়। আল্লাহ যা হারাম করেননি তাকে হারাম বলার এখতিয়ার কারো নেই। আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময় আরবের মেলায় উৎসবে নাচ-গানের আয়োজনে যৌনতার ছড়াছড়িকে আল্লাহর রসুল নিষিদ্ধ করেছেন। সেসব হাদিসকে সামনে এনে নাচ, গান ও বাদ্যকেই হারাম বলে ফতোয়া প্রদান করা হলো। ইমাম আবু হানিফার নামে প্রচলিত মাজহাব এ ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর। হানাফি মাজহাবের আলেমদের মতে সকল প্রমোদ সামগ্রী হারাম, সর্ব প্রকার বাঁশি এবং "দফ"ও হারাম। এমন কি লাঠি দিয়ে বাড়ি মারাও হারাম। আর যারা এসব কাজ করে তারা অবশ্যই ফাসেক হয়ে যায়। যার ফলে তার স্বাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়, বরং ফুকাহারা বলেন-এসব দ্বারা আনন্দ নেয়া কুফরী। [আউনুল মাবুদ-১৩/১৮৬]

উল্লেখ্য যে, এটা ইমাম আবু হানিফার মাজহাবের অনুসারী ফুকাহাদের মত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.) স্বয়ং কি গান হারাম মনে করতেন? তাঁর জীবন তো ভিন্ন কথা বলে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায়, প্রতি রাতে ইমাম আবু হানিফা (র.) এক প্রতিবেশীর গান শুনতেন (তাজকেরাতুল হামদাভিয়া)। সঙ্গীতজ্ঞ ইমাম আহমদ ইবনে আবদে রাব্বিহী লিখেছেন, "আবু হানিফা (র.) একবার তার প্রতিবেশী সঙ্গীতজ্ঞ আমরকে জামিনে নিয়ে আসেন, যেহেতু তিনি গায়ক আমরের সুমধুর স্বর শ্রবণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন (ইবনে রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ: ৩ খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা আব্দুল গনি নাবলাশী হানাফীও ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন। এক রাতে ইমাম আবু হানিফা (র.) তার প্রতিবেশী গায়ক আমরের কণ্ঠস্বর শুনতে পান নি। তিনি প্রতিবেশীর খোঁজে বের হলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, কুফা নগরীর আমির (শাসক) আইনী

গায়ক আমরকে কোনো একটি অভিযোগে বন্দী করেছেন। আবু হানিফার (র.) অনুরোধে আমির আইনীর সঙ্গীতজ্ঞ আমরকে মুক্তি দিতে রাজি হলেন। কিন্তু দেখা গেল আমর নামে একাধিক কয়েদি আছে। আমির স্থির করলেন যে, খ্যাতনামা ফকীহ ইমাম আবু হানিফার (র.) সম্মানার্থে তিনি আমর নামীয় সকল কয়েদীকেই মুক্ত করে দিবেন।

আল্লামা আলী কারী হানাফী 'সামা' নামীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবু হানীফা (র.) সঙ্গীত শ্রবণ করতেন। ইমাম ইউসুফ সঙ্গীত উপভোগ করতেন খলিফা হারুন-অর-রশীদের দরবারে। তাকে সঙ্গীতের বৈধতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, যদি সঙ্গীত অবৈধ হতো, তবে ইমাম আজম প্রতি রাতে সঙ্গীত শ্রবণ করে সময় নষ্ট করতেন না।

ইসলামে সঙ্গীত বৈধ হওয়ার শত শত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেন এর বিপরীত ধারণা মুসলিম দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হলো এর উত্তর কী? এর উত্তর হচ্ছে, যে আমলে সুলতানরা ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে সারাদিন সঙ্গীত-সুরা-সাকী নিয়ে পড়ে থেকেছেন তখনই বিভিন্ন মাজহাবের ফকীহগণ ব্যাপকভাবে সঙ্গীতকে হারাম ফতোয়া দিয়েছেন এবং সেসব ফতোয়া তাদের মাজহাবের ইমামদের নামে প্রচারিত হয়ে গেছে। যদিও অনেক আলেম এর বিপরীত মতও দিয়েছেন। যেমন: **ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালী তাঁর 'এহইয়াও উলুমদ্দিন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "কোকিলের সুর শোনা যেমন হারাম নয়, তেমনি মানুষের ইচ্ছা মোতাবেক কণ্ঠ নিঃসৃত সুর শ্রবণ করাও হারাম নয়। প্রাণহীন যন্ত্রের সুর এবং প্রাণীর স্বর পৃথক নয়। মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত সুর, বিভিন্ন তারযন্ত্রের ওপর আঘাত বা ঘর্ষণজনিত আওয়াজ, দফ, তবলা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজও হারাম নয়"।**

সুতরাং একচেটিয়াভাবে সঙ্গীতকে হারাম বলে ঘোষণা দেওয়ার সুযোগ নেই, বরং হালাল সঙ্গীত ও হারাম সঙ্গীতের মাঝখানে আল্লাহর নীতি মোতাবেক সীমারেখা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

১৩ জুলাই ২০১৮ তারিখে রাজধানীর তেজগাঁও কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় হেযবুত তওহীদের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন। প্রধান অতিথি ছিলেন হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাতিকে নব-উদ্যমে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য গানে গানে অনুপ্রেরণা যোগান মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ।

গত ২ জুন ২০২৪ নোয়াখালী জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নোয়াখালী সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ কাজী মোহাম্মদ রফিক উল্লাহ। মাটি'র চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্পাদক টিএইচ মোহনের সার্বিক পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন মাটি'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি রিয়াদুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন নোয়াখালী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিথুন ভট্ট, নারী অধিকার জোটের সভাপতি বেগম লায়লা পারভীন, আপন শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান শিশু মনোবিজ্ঞানী সুলতানা রাজিয়া, নোয়াখালী পৌর মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসিনা চৌধুরী, নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কবি ও সাংবাদিক জামাল হোসেন বিশাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মাটি'র নিয়মিত শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন। এছাড়াও নাটক, আবৃত্তি, একক অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করে নোয়াখালী চাষীরহাট নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের একঝাঁক ক্ষুদে শিল্পী।

‘দৈনিক দেশেরপত্র’র ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ইং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সঙ্গীত ও নৃত্যকলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান আবৃত্তি ও নাটক পরিবেশন করে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। দেশেরপত্রের সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি প্যানেলে ছিলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, বিএফইউজে এর সভাপতি ওমর ফারুক ও বাংলাদেশ কমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিসিএসসিএল) বোর্ড চেয়ারম্যান প্রযুক্তিবিদ ড. শাহজাহান মাহমুদ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এশিয়ান টিভির চেয়ারম্যান আলহাজ হারুন-উর-রশিদ সিআইপি। প্রধান আলোচক ছিলেন পিনাকল মিডিয়া লিমিটেড এর চেয়ারম্যান ও হেযবুত তওহীদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

৮ মার্চ ২০২৪ইং ‘সংস্কৃতি চর্চার হাত ধরে আসুক নবজাগরণ’ এই শ্লোগানে জামালপুরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্বসহ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ।

গত ২০ এপ্রিল ২০২৪ইং মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমিতে আলোচনা সভা ও ঈদ পুনর্মিলনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাটি’র সহ সভাপতি রিয়াদুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিনসহ স্থানীয় সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গ। সভা শেষে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নিয়মিত শিল্পীবৃন্দ ও স্থানীয় শিল্পীরা গান, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে দৈনিক বজ্রশক্তির ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিশু একাডেমী মিলনায়তনে একটি বিশেষ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশবরেণ্য নাট্যব্যক্তিত্ব, শিল্পী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, বিচারপতি, সমাজকর্মী, মানবাধিকারকর্মীগণের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে দিয়েছিল অনন্য মাত্রা। অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন জঙ্গিবাদ, হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। অনুষ্ঠানে কেক কেটে দৈনিক বজ্রশক্তির ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

কণ্ঠ সৈনিক মাজহারুল ইসলাম

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ ও অসামান্য কণ্ঠশৈলী প্রদর্শন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা ও জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনকণ্ঠ জনাব মাজহারুল ইসলাম।

নাট্যজন মামুনুর রশিদ

বিচারপতি সিকদার মকবুল হক

অ্যাডভোকেট মঞ্জিল মোর্শেদ

বিচারপতি সিদ্দিকুর রহমান মিয়া

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব নাট্যজন মামুনুর রশিদ, বিশিষ্ট আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী ব্যারিস্টার মঞ্জিল মোর্শেদ, বিচারপতি সিকদার মকবুল হক ও বিচারপতি সিদ্দিকুর রহমান মিয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুর রহিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সুপার নিউমারারী অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ও নগর সৌন্দর্যবিদ রাফেয়া আবেদিন প্রমুখ। সবশেষে সঙ্গীত পরিবেশন করে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীরা।

৩০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রাজধানীর ওয়ারিতে "সন্ত্রাস দমনে জনসম্পৃক্ততার বিকল্প নেই" শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। আলোচনা অনুষ্ঠানের পর শহীদ কাজী আরেফ উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান।

০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে রাজধানীর মগবাজারে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে ছিল মূলত শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। প্রধান অতিথি হিসাবে সংস্কৃতিচর্চার গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

২০১৬ সনে চুয়াডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী বিশু শাহ বাউল উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। হাজার হাজার দর্শক শ্রোতাকে গানে গানে জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান হেযবুত তওহীদের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নিয়মিত শিল্পী খন্দকার নাজমুল আলম শান্ত। *(তারিখ: ০৪ মার্চ ২০১৬, স্থান: আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা)*

উপাস্যে পরিণত করা না হলে কোনো মহান ব্যক্তির ভাস্কর্য নির্মাণকেও ইসলামে হারাম ঘোষণার দলিল পাওয়া যায় না।

অন্যান্য শিল্পচর্চা

কাবাঘরে ঈসা (আ.) ও মা মরিয়মের (আ.) একটি যুগল ছবি অঙ্কিত ছিল। রসুলাল্লাহ সেই ছবিটা নিজের পবিত্র হাত দিয়ে ঢেকে রেখে বলেছিলেন- এই ছবিটা ছাড়া বাকি সব ধুয়ে মুছে ফেল।

-সিরাত ইবনে ইসহাক

একইভাবে ইসলামের বৈধ-অবৈধর মূলনীতি মেনে চললে যে কোনো শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাই জাতির জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারে। আল্লাহর অবাধ্যতা, অশ্লীলতা ও মিথ্যার বিস্তার না ঘটিয়ে ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণ করা, নাটক-চলচ্চিত্র নির্মাণ করা, শরীর গঠনমূলক খেলাধুলা করা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় নয়। মসজিদে নববীর প্রাঙ্গণে নিয়মিতভাবে ঘোড়দৌড়, কুস্তি, তলোয়ার যুদ্ধ, বর্শা খেলা, তীরন্দাজী, দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো, রসুলাল্লাহ স্বয়ং সেগুলোতে উপস্থিত থাকতেন, অংশও নিতেন। সুতরাং যেসব খেলায় শরীর চর্চা হয়, দম, সাহস ও ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পায় সেসব খেলাকে ইসলাম উৎসাহিত করে। তবে যেসব খেলা মানুষকে অন্তর্মুখী করে সেসব খেলা এবং খেলা নিয়ে জুয়া ইসলামে নিষিদ্ধ।

ইসলামের বীর সেনাপতি ওকবা বিন নাফের ভাস্কর্য।
স্থান: আলজেরিয়া।

মুসলিম পণ্ডিত ইবনে খালদুনের ভাস্কর্য। যিনি ছিলেন আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও অর্থনীতি শাস্ত্রের জনকদের মধ্যে অন্যতম।
-কাসবাহ, বেজাইয়া, আলজেরিয়া

মুসলমানদের জন্য মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ, তাই বলে অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতিমা ভেঙে ফেলতে হবে এমন কোনো হুকুম আল্লাহ দেন নি। উপাস্যে পরিণত করা না হলে কোনো মহান ব্যক্তির ভাস্কর্য নির্মাণকেও ইসলাম হারাম করে না। তাছাড়া খেলার উদ্দেশে তৈরি মানুষ বা জীবজন্তুর পুতুলের উপরও রসুলাল্লাহর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এমন কি তাঁর ঘরেও এ জাতীয় খেলনা মানবাকৃতির পুতুল ও পক্ষীরাজ ঘোড়ার পুতুল ছিল বলে জানা যায় (আবু দাউদ, বায়হাকি)। আম্মা আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত- **'আমি রসুলাল্লাহ (সা.) এর উপস্থিতিতে পুতুল দিয়ে খেলতাম। আমার বান্ধবীরাও আমার সাথে খেলত। যখন রসুলাল্লাহ (সা.) আসতেন তখন তারা লুকিয়ে যেত। কিন্তু নবী (সা.) তাদেরকে ডাকতেন এবং খেলায় অংশগ্রহণ করতে বলতেন**। -সহিহ বুখারি, কিতাবুল আদব, অধ্যায়ঃ ৭৩, হাদিসঃ ১৫১

মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘর থেকে যখন সকল দেবদেবীর মূর্তিগুলো অপসারণ করা হয়, তখন কাবার দেওয়ালে আঁকা অনেক দেবদেবীর ছবিও পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়। সেখানে ঈসা (আ.) ও মা মরিয়মের (আ.) একটি যুগল ছবি অঙ্কিত ছিল। রসুলাল্লাহ (সা.) সেই ছবিটা নিজের পবিত্র হাত দিয়ে ঢেকে রেখে বলেছিলেন, এই ছবিটা ছাড়া বাকি সব ধুয়ে মুছে ফেল। (সিরাত ইবনে ইসহাক)।

কোরআনে সুরা সাবার ১৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, **"তারা (নির্মাণশ্রমিকরা) সোলায়মানের (আ.) ইচ্ছানুযায়ী উপাসনালয় ও দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউজসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত।"** আল্লাহ সকল নবীদেরকে পাঠিয়েছেন শেরেকের বিরুদ্ধে। তাঁরা সবাই এর বিরুদ্ধে ছিলেন। যদি ভাস্কর্য শেরক হতো তাহলে নবী সোলায়মান (আ.) ভাস্কর্য নির্মাণ করতেন না। শেষ নবীর ইসলামেও যে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ছিল না তার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও রয়েছে। আবু বকর (রা.) এর শাসনামলে আমর বিন আসের (রা.) মিশর অভিযানের পরও ফারাওদের তৈরি স্ফিংসসহ বিভিন্ন ভাস্কর্য অক্ষত রেখেছিলেন। খ্রিষ্টানদের চার্চের জন্য তিনি নিজে যিশুর মূর্তি গড়ে দিয়েছিলেন। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রা.) ইরাকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সময়ও সেখানকার কোনো ভাস্কর্য, মূর্তি ভাঙ্গা হয়নি। ভাঙা হয়নি বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তিও। অথচ মাত্র কয়েক বছর আগে তালেবানরা বোমা মেরে সেই মূর্তিগুলো গুড়িয়ে দিয়েছে।

ধর্ম দেশীয় সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ নয়

আমাদের দেশের অনেক আলেম ও মুফতির দৃষ্টিতে চৈত্র সংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, নবান্ন ইত্যাদি আঞ্চলিক উৎসব পালন করা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির অনুসরণ। সুতরাং এগুলো শেরক। আসলেই কি তাই? পূর্বেই বলেছি ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যার বিধানগুলো কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা বা আঞ্চলিকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি জনপদের মানুষের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে, যা হাজার হাজার বছরের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। তাই ইসলামে একটি বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে আরেকটি অঞ্চলের মানুষের উপর চাপিয়ে দেয় নি, তেমনি কোনো এলাকার মানুষের আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে নিষিদ্ধও করা হয় নি। আল্লাহর শেষ রসুল (সা.) আরবে এসেছেন, তিনি আরবের মানুষ, তাঁর আসহাবগণও আরবের মানুষ। আমাদের দেশের একজন নেতা বাংলাতে কথা বলবেন, বাংলাদেশের পোশাক পরবেন এটাই স্বাভাবিক। তেমনি রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা আরবীয় পোশাক পরেছেন, আরবিতে কথা বলেছেন, আরবীয় খানা-খাদ্য খেয়েছেন। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না, যে সারা দুনিয়ার মানুষকেই ঐভাবে আরবিতে কথা বলতে হবে, আরবীয় জোব্বা, পাগড়ি পরিধান করতেই হবে। কারণ যারা তাঁদের বিরোধিতাকারী তারাও একই পোশাক পরেছে, একই প্রকার খাদ্য খেয়েছে।

ড্রোন ক্যামেরায় ধারণকৃত নোয়াখালীর চাষীরহাট উন্নয়মেলার চিত্র। চাষীরহাট উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনীর পাশাপাশি দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা ও ঐতিহ্য রক্ষায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজন রাখা হয় এই মেলায়। এই উন্নয়ন মেলার প্রধান উপদেষ্টা হেযবুত তওহীদের এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

‘আরবীয় সংস্কৃতি’ মানেই ‘ইসলামী সংস্কৃতি’ নয়

সুতরাং আমরা বুঝলাম, ‘আরবীয় সংস্কৃতি’ মানেই ‘ইসলামী সংস্কৃতি’ নয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী পুরুষদের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। এখন কেউ যদি প্যান্ট পরে বা ধুতি পরে তাহলেও কিন্তু তার সতর আবৃত হয়। কিন্তু প্যান্ট বা ধুতি পরাকে কি আলেমরা ইসলামী সংস্কৃতি বলে মেনে নেবেন? না, তারা একে খ্রিষ্টানি বা হিন্দুয়ানী পোশাক বলে অপছন্দের চোখে দেখবেন। তারা চান মানুষকে তেমন জোব্বা পরাতে যেটা আরবের লোকেরা পরে থাকেন। তারা ভুলে যান যে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আরবের সকল মানুষই ঐ জাতীয় পোশাকই পরে থাকেন, কারণ সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে ঐ পোশাক সঙ্গতিশীল। কিন্তু আমাদের দেশের জেলে-চাষী যারা লুঙ্গি কাছা দিয়ে মাছ ধরেন, চাষ করেন, তারা কী করবেন? আরবীয় জোব্বা পরে কি এই কাজগুলো করা যাবে? মনে রাখতে হবে খাদ্যাভ্যাস, পোষাক, ভাষা ইত্যাদি হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং এটা ভৌগোলিক আবহাওয়ার কারণে স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে। এখন কেউ যদি স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরবদের পোশাক, খাদ্যাভ্যাস রপ্ত করে নেয় তাহলে সেটা তার সংস্কৃতিতে পরিণত হবে এবং এক্ষেত্রে কোনো

সমস্যাও নাই। সমস্যা হচ্ছে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ায়। মূলত জোর করা ততটুকু যুক্তিসঙ্গত যতটুকু আল্লাহ শরিয়তে বাধ্য (ফরজ) করেছেন।

> **আমাদের দেশের জেলে-চাষী যারা লুঙ্গি কাছা দিয়ে মাছ ধরেন, চাষ করেন, তারা কী করবেন? আরবীয় জোব্বা পরে কি এই কাজগুলো করা যাবে?**

ডিজিটাল ডিভাইস, মাদকাসক্তি, অপরাজনীতি ও অপসংস্কৃতির কালো থাবা থেকে তরুণদের রক্ষা করতে দেশজুড়ে জাতীয় খেলা কাবাডির আয়োজন করছে হেযবুত তওহীদ। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী কাবাডি টুর্নামেন্ট।

নোয়াখালীর চাষীরহাট উন্নয়মেলায় গীতি আলেখ্যে পরিবেশন করে মাটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ক্ষুধে শিল্পীরা। তাদের পরিবেশনায় ফুটে ওঠে গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ঐহিত্য। এছাড়াও গান, জারি, আবৃত্তি, একক অভিনয়ে অংশ নেয় তারা।

ফিতা কেটে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত নোয়াখালীর চাষীরহাট উন্নয়মেলা ২০২৪ এর শুভ উদ্বোধন করেন চাষীরহাট উন্নয়ন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। সাতদিন ব্যাপী মেলায় পণ্য প্রদর্শনী ও মেলার পাশাপাশি দেশীয় সংস্কৃতির চর্চায় জোড় দেওয়া হয়।

বাংলার

গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ ইং নোয়াখালীতে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত চাষীরহাট উন্নয়ন মেলায় বাংলার ঐতিহ্য শীতকালীন পিঠা-পুলির দোকান পরিদর্শন করছেন চাষীরহাট উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান উপদেষ্টা ও হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

২৩ ডিসেম্বর ২০২২ ইং তারিখে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে চাষীরহাট নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পিঠা মেলা পরিদর্শন করছেন হেযবুত তওহীদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

নিজস্ব সংস্কৃতি

এটা অপ্রাকৃতিক বলেই মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষ উভয়কেই পোশাকের ব্যাপারে বলেছেন, দৃষ্টিকে অবনত কর, লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখো। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'মুমিনদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।' (সুরা নুর ৩০)। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ দিয়েছেন। পরের আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, 'আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে, তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।' (সুরা নুর ৩১)।

এখন লজ্জাস্থান (আওরাহ) কোনটা, কতটুকু ঢেকে রাখা পুরুষের জন্য ফরজ তা শরিয়াহ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। যেমন হানাফি মাজহাবের ফিকাহ শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ আল-হিদায়াহ অনুসারে পুরুষের সতর হল নাভীর নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত। কেননা রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, পুরুষের সতর হল নাভী থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ। অন্য বর্ণনায় আছে, রসুল (সা.) বলেছেন, নাভীর নিচ থেকে তার হাঁটু অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত (আবু দাউদ : ৪৯৭)। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম শাফেয়ী ভিন্নমত পোষণ করেন। (আল-হিদায়াহ, ১ম খণ্ড, সালাতের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ অধ্যায়)।

উইকিপিডিয়াতে প্রদত্ত Islamic clothing নামক প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে, "সুন্নী ইসলামের প্রচলিত মতানুসারে পুরুষদের জন্য বাধ্যতামূলক হচ্ছে তাদের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা, যদিও তাদের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ আছে যে, পুরুষদের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক, নাকি শুধু দুই উরুর মধ্যবর্তী অঙ্গ (যৌনাঙ্গ)।"

ইমাম আহমদ বলেন, "একজন পুরুষের আওরাহ (লজ্জাস্থান) হল নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান। তবে নাভি নিজেই এবং প্রতিটি হাঁটু আওরাহ নয়। উরু আওরাহ। সালাতের সময় ও সালাত ছাড়া অন্যান্য সময়ের জন্য এই একই নিয়ম।" (আল মুগনি-ইবনে কাদামা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৭৭, ৫৭৮। মাকতাবা আল জুমহুরিয়া আল আরাবিয়া, কায়রো, মিশর। আল ফিকহ আল ইসলাম ওয়া আদিলাতিহি, খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৭৪৫-৭৫৩, মাকতাবা রাশেদিয়া কোয়েটা পাকিস্তান)। সুতরাং উলঙ্গ না থাকলেই ফরজ আদায় হয়ে গেল। কাছা দিয়ে মাছ ধরা, চাষাবাদ করা বা গাছে ওঠায় শরিয়াহগত কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এরপরে পোশাক নিয়ে আর বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই।

তবে পোশাক কেবল লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্যই নয়, পোশাক মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, মর্যাদা প্রকাশ করে। তাই আল্লাহ বলেন, 'হে বনী-আদম আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং তাকওয়ার পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।' (সুরা আরাফ ২৬)।

ইসলাম সর্বোত্তম আদর্শ, মুসলিম জাতি একটি সভ্য জাতি। কাজেই তাদের সামাজিক অনুষ্ঠান, সালাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পোশাকে, ভাষায়, শিল্প-সংস্কৃতিতে সৌন্দর্যবোধ থাকতেই হবে। পাশাপাশি থাকতে হবে তাকওয়া, আল্লাহ প্রদত্ত মানদণ্ডের প্রতি আনুগত্য। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। তাই সাদামাটা, বেরঙিন পোশাক পরে দরবেশি ও দুনিয়াবিমুখতা প্রকাশ করার কোনো মাহাত্ম্য ইসলামে নেই। আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আল্লাহর সাজসজ্জাকে (জিনাত), যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্রবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুনঃ এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মো'মেনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে যারা বুঝে। (সুরা আরাফ ৩২)।

পোশাক নির্ভর করে মূলত পেশা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর। কাজের পোশাক পরে যেমন কেউ বিয়ের অনুষ্ঠানে যায় না তেমনি সকল শ্রেণিপেশার মানুষকে আরবীয় জোব্বা পরিয়ে দেওয়াও ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। সতর ঢাকার পর তার চেয়ে অধিক আপনি যেমন খুশি পোশাক পরতে পারেন। কী পোশাক দিয়ে আপনি সতর ঢাকবেন বা কী ধরনের পোশাক পরে নিজেকে সভ্য সমাজে উপস্থাপন করবেন, সেটা একান্তই আপনার অভিরুচি। আপনি চাইলে দেশীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করতে পারেন, চাইলে আরবের সংস্কৃতিও অনুসরণ করতে পারেন। আরবের সংস্কৃতির পোশাকের সঙ্গে সওয়াব বা গোনাহের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

আর নারীদের সতর হচ্ছে মুখমণ্ডল, হাত, পায়ের পাতা ছাড়া সারা শরীর। পবিত্র কোর'আনে সুরা নূরের ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, তারা (মো'মেন নারীরা) যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। বর্তমানে আপাদমস্তক ঢেকে রাখার বিধানটা পরহেজগারীর নিদর্শনস্বরূপ করা হয়ে থাকে কিন্তু সাধারণ প্রকাশমান অঙ্গগুলো খোলা রাখাই আল্লাহর নির্দেশ। এই অঙ্গ কোনগুলো সেটা নিয়ে প্রসিদ্ধ ফেকাহ গ্রন্থ হেদায়াহ-তে বলা হচ্ছে যে, মুখমণ্ডল এবং কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত খোলা রাখার যৌক্তিক কারণ হলো এই যে, পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদের লেনদেন তথা দেওয়া নেওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। কাজেই মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা রাখারও বিশেষ জরুরত রয়েছে। [আল হেদায়াহ (৪র্থ খণ্ড), পৃষ্ঠা ১৬৯ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)]।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদিস থেকেও এই কথার সমর্থন মেলে। তিনি বলেন, একদিন আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রসুলাল্লাহর (সা.) নিকট গেলেন। তিনি তখন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ হে আসমা! মেয়েরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তার শরীরের কোনো অঙ্গ দৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, তবে কেবলমাত্র এটা এবং এটা ব্যতীত। এ বলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডল এবং তাঁর দু' হাতের তালুর দিকে ইঙ্গিত করলেন (আবু দাঊদ ৪১০১)। এই হল ইসলাম মোতাবেক নারীর পোশাকরীতি। এই মানদণ্ড মেনে নারী যে কোনো পোশাক পরিধান করতে পারে, তাকে আরবীয় পোশাক পরতেই হবে, বাঙালি ঐতিহ্যের পোশাক পরা যাবে না- এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ইসলাম আরোপ করে না। আবার কেউ যদি আরবদের পোশাক রীতি অনুসরণ করে সেটা তার রুচি, এতেও দোষের কিছু নাই। তবে কেউ আরবীয় পোশাক পরে এটা দাবি করতে পারে না যে সে অধিক মুত্তাকি, বা অধিক ফজিলতের হকদার।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি। বাংলার কৃষক ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান যা-ই হোক, তার আনন্দ, বেদনা, উৎসব, আশা-নিরাশার সঙ্গে কৃষি ও ফসলের সম্পর্ক থাকবে এটাই স্বাভাবিক। নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দ তাই এ অঞ্চলের মানুষের প্রাণের সঙ্গে যুক্ত। বাংলা ফসলি পঞ্জিকার সঙ্গে এদের

ভাত-কাপড়ের সম্পর্ক। তাই চৈত্রসংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, নবান্ন ইত্যাদি কৃষিনির্ভর উৎসবকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আমরা পবিত্র কোর'আনের সুরা আন'আমের ১৪১ নম্বর আয়াতটি থেকে কৃষি-সংস্কৃতির দিবস উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে আল্লাহর নীতিমালা জানতে পারি। এ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, "তিনিই শস্যক্ষেত্র ও সবজি বাগান সৃষ্টি করেছেন, এবং সে সমস্ত লতা জাতীয় গাছ যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খেজুর গাছ ও বিভিন্ন আকৃতি ও স্বাদের খাদ্যশস্য। এবং জলপাই জাতীয় ফল ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- যা একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন তা খাওয়ার উপযোগী হয় এবং ফসল তোলার দিনে এগুলোর হক আদায় করো। কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।"

এ আয়াতে তিনটি প্রসঙ্গ লক্ষণীয়-

- ফসল তোলার দিন
- হক আদায় করা
- অপচয় না করা

কোর'আনের প্রসিদ্ধ ইংরেজি অনুবাদগুলোতে (যেমন: আল্লামা ইউসুফ আলী, মারমাডিউক পিকথল) ফসল তোলার দিনের অনুবাদ করা হয়েছে Harvest day. উক্ত আয়াতটিতে আমরা কয়েকটি বিষয় পাচ্ছি-

- কৃষক যা কিছু চাষ করে তা ফল বা ফসল যাই হোক, সেটা কাটার দিন (ইয়াওমুল হাসাদ) এর হক আদায় করতে হবে। সেই হক হচ্ছে- এর এক একটি নির্দিষ্ট অংশ (উশর) হিসাব করে গরিব মানুষকে বিলিয়ে দিতে হবে।

- যেদিন নতুন ফসল কৃষকের ঘরে উঠবে সেদিন স্বভাবতই কৃষকের সীমাহীন আনন্দ হবে। এই আনন্দের ভাগিদার হবে গরিবরাও। কেননা তারা ফসলের অধিকার পেয়ে সন্তুষ্ট হবে, তাদের দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। কিন্তু আল্লাহ সাবধান করে দিলেন এই আনন্দের আতিশয্যে যেন কেউ অপচয় না করে।

এখন কথা হচ্ছে, বর্তমানে আমাদের দেশে যেভাবে (Process) পহেলা বৈশাখ পালন করা হয় সেটা কী উদ্দেশ্যে করা হয়? তাতে কি আল্লাহর দেওয়া দরিদ্রের অধিকার ও আনন্দ উদ্‌যাপনের মানদণ্ড রক্ষিত হয়?

না। বর্তমানে পহেলা বৈশাখের নামে প্রকৃতপক্ষে যা করা হয় তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই বাণিজ্যিক। আমরা জানি যে, ঈদ, বড়দিন, পূজা, প্রবারণা ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় উৎসব হলেও বাস্তবে এগুলো কিছু স্বার্থান্বেষী শ্রেণির বাণিজ্যের উৎসে পরিণত হয়েছে। পহেলা বৈশাখে একটি ৫০০ টাকার ইলিশের দাম হয়ে যায় ৫,০০০ টাকা, শুকনো মরিচ আর পান্তাভাতের দামও হয় আকাশচুম্বী। আবার অনেক অশ্লীলতারও বিস্তার ঘটছে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। আজ পহেলা বৈশাখের উৎসবকে নিয়ে সিন্ডিকেট করা হচ্ছে, রাজনীতি করা হচ্ছে। যখন কোনো সাংস্কৃতিক উৎসব পালনের নামে অন্যায় ও অশ্লীল অপসংস্কৃতির চর্চা হয়, কোনো বিষয়ে সীমালংঘন, অপচয় এবং বাড়াবাড়ি দেখা দেয়, তখন এর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল শ্রেণি ও আলেমদের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতেই পারে। তাই আমাদের উচিত হবে সকল কিছুকেই একটি ভারসাম্যের মধ্যে নিয়ে আসা। আনন্দ উৎসব সবই করব কিন্তু করব শৃঙ্খলা ও পরিমিতিবোধ বজায় রেখে।

সুতরাং এটা বোঝা গেল যে, ইসলাম সঙ্গীত, বাদ্য সুর-সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ করে নি। নিষিদ্ধ করেছে অশ্লীলতা, নোংরামী, অন্যের ক্ষতি হয়, আল্লাহর নাফরমানি করা হয় এমন বিষয়কে। আর অশ্লীলতা নিশ্চয়ই কোনো ধর্মই সমর্থন দেয় না। সংস্কৃতি চর্চা বাদ দিয়ে মানবসভ্যতা চলতে পারে না। আমরা হেযবুত তওহীদও ইসলামের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মৌলিক নীতিকে উপলব্ধি করে সেই শিক্ষার আলোকে গড়ে তুলেছি নিজস্ব সাংস্কৃতিক অঙ্গন। গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি শিল্পকলার মাধ্যমে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কাছে শিল্প-সংস্কৃতি সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের হাতিয়ার। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে হেযবুত তওহীদের এই যাত্রা শুরু হয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর হাত ধরে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের একজন অনুরাগী ছিলেন। উপমহাদেশের খ্যাতনামা সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে তিনি রাগসঙ্গীতের তালিম নেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে এমামুয্‌যামান ও কয়েকজন সমমনা বন্ধু উদ্যোগ নিয়ে ঢাকার মগবাজারে অবস্থিত নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হেযবুত তওহীদের দলীয় সঙ্গীত হিসাবে নজরুলের লেখা 'আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান' গানটি নির্বাচন করে দেন।

হেযবুত তওহীদ আল্লাহর হুকুম ও নীতির মধ্যে থেকে মানবজাতির জন্য একটি সুস্থ, শালীন সংস্কৃতির রূপরেখা তুলে ধরছে। এই সংস্কৃতি মানুষকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল করবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে করবে প্রতিবাদী। তারা হবে নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমী, জাতির জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী সৈনিক। এ সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে আপনিও স্বাগত।

শেষ কথা

মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও শিল্প-সংস্কৃতি

মানুষ আর দশটা প্রাণীর মত নয়। সে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ (আশরাফুল মাখলুকাত)। তার এই শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তার উন্নত মস্তিষ্কের জন্য নয়, বরং দায়িত্বের দিক থেকেও মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। সেই দায়িত্ব পালন করাই হচ্ছে তার এবাদত বা মূল কাজ। মানুষ যদি তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে অনবহিত থাকে তাহলে সে আমৃত্যু হালবিহীন নৌকার মত দিগ্বিদিক ভেসে বেড়াবে, কোনো গন্তব্য সে খুঁজে পাবে না। একেকজন মানুষ একেক উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচবে, একেক কাজে ব্যস্ত থাকবে। তার জন্ম ব্যর্থ হবে।

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির পূর্বে সকল সৃষ্টিকে তথা মালায়েকদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।' তারা বললো, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, নিশ্চয়ই 'আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।' (সুরা বাকারা ৩০)। সুতরাং আল্লাহ বললেন যে, তিনি মানুষকে তাঁর খলিফা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে মানুষের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহর খলিফা, প্রতিনিধি, Representative.

প্রতিনিধিত্ব করতে হলে ক্ষমতাও দিতে হয়, তাই তিনি মানুষের ভিতরে তাঁর নিজের রূহ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহর সকল গুণাবলি মানুষের মধ্যে চলে এলো, যদিও খুবই স্বল্প মাত্রায়। মানুষ লাভ করল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। সে চাইলে আল্লাহর হুকুম মানতেও পারে, চাইলে নাও মানতে পারে। আল্লাহ মানুষের বিরুদ্ধশক্তি হিসাবে দাঁড় করালেন ইবলিসকে এবং তাকে শক্তি দিলেন মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য। আল্লাহ মানুষ ও ইবলিসকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন আর বলে দিলেন, আদমের এই পার্থিব জীবন তার জন্য একটি পরীক্ষা। তিনি যুগে যুগে তাঁর পক্ষ থেকে পথপ্রদর্শক পাঠাবেন মানুষকে হেদায়াত করার জন্য। মানুষ সেই পথ গ্রহণ করলে পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করবে এবং মৃত্যুর পর জান্নাতে ফিরে যাবে। গ্রহণ না করলে পৃথিবীতে অশান্তি ও রক্তপাতের মধ্যে বাস করবে আর পরকালেও জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। (সুরা বাকারা ৩৮-৩৯)।

স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের দায়িত্ব হল, আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান মেনে চলার মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এটা করতে পারলে ইবলিসের বিপরীতে আল্লাহর বিজয় হবে। আর যদি মানুষ নিজেরা জীবনবিধান তৈরি করে সে মোতাবেক চলে তাহলে পৃথিবীতে অন্যায়, অশান্তি বিরাজ করবে এবং ইবলিসের বিজয় হবে। মানুষ যদি পৃথিবীতে এসে তার এই মূল দায়িত্বটি ভুলে যায় এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, তাহলে তার জীবন ব্যর্থ হল।

অগণিত নবী-রসুলের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ পথপ্রদর্শক হিসেবে আল্লাহ পাঠালেন মুহাম্মদ (সা.) কে। তিনি দুর্বার সংগ্রাম করে আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি, সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করলেন। আল্লাহর নির্দেশ মতো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, এমন কার্যকলাপকে হারাম বা নিষিদ্ধ করলেন। সেখানে কিন্তু তিনি শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকে হারাম করেন নি। কারণ সংস্কৃতি মানুষের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য অঙ্গ। একে বাদ দিয়ে কোনো জীবনব্যবস্থাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কিন্তু শিল্প সংস্কৃতির চর্চার নামে অশ্লীলতা, মিথ্যাচার, আল্লাহর অবাধ্যতা যেন বিস্তার না লাভ করে সে ব্যবস্থা করলেন।

তিনি তাঁর জাতিকে শেখালেন তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও তাদের প্রকৃত এবাদত হচ্ছে সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর দীন, জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি, ন্যায়, সুবিচার নিশ্চিত করা এবং এভাবে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে বিজয়ী করা। এই মূল কাজ বাদ দিয়ে মানুষ যদি সঙ্গীত, শিল্প, কলা, সাহিত্য নিয়ে পড়ে থাকে, গান-বাজনা করে জীবন পার করে দিতে চায়, তাহলে সেটা হবে ভারসাম্যহীনতা। ইসলাম সকল ধরনের বৈরাগ্যকে নিরুৎসাহিত করে। যেসব বিষয় মানুষকে বুঁদ করে রাখে, গতিহীন করে ফেলে, অথর্ব বানায়, জড় বস্তুতে পরিণত করে সেসব বিষয় ইসলাম সমর্থন করে না।

বরং সংস্কৃতি চর্চার মধ্যেও মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যে গান গাওয়া হবে তা জেহাদ হিসেবে, এবাদত হিসাবে পরিগণিত হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল সঙ্গীত। ঠিক তেমনি রসুলাল্লাহর যুগে রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে যোদ্ধারা রণসঙ্গীত গাইতেন, উদাত্ত কণ্ঠে সুরে সুরে আবৃত্তি করতেন যুদ্ধের কবিতা। গণসঙ্গীত, রণসঙ্গীত সৈনিকের হৃদয়ে ঝংকার তোলে। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার হিম্মত এনে দেয়।

কাজেই রেনেসাঁ ও গণজাগরণ সৃষ্টির জন্য গান খুবই প্রয়োজনীয় ও কার্যকর মাধ্যম। গান হতে পারে বিপ্লবের ভাষা, মানবতার জয়ধ্বনি, মনের প্রশান্তি, আত্মার খোরাক। সমাজে বিরাজিত অন্যায়, অবিচার, জুলুমের বিরুদ্ধে গান হতে পারে সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার। তাই যারা গীতিকার তাদের কর্তব্য হবে কেবল প্রেম-বিরহের গান না লিখে সমাজের সংকটগুলো নিয়ে গান লেখা, কবিতা লেখা। একইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যারা মেধাবী তাদের উচিত শিল্প-সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে রেনেসাঁ সৃষ্টির জন্য আত্মনিয়োগ করা।